ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 268- 273
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.206

নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্প: দেশভাগ ও মানুষের স্বপ্নভঙ্গের আখ্যান

ড. আজিমুদ্দিন মণ্ডল, *অতিথি অধ্যাপক, রানী ধন্য কুমারী কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.11.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Partition[1] devastated[2] the lives and livelihoods of the marginalized people[3] in society beyond measure. Independence[4] could not bring a new dawn for the uprooted. Contrary to the belief that freedom means the realization of all hopes, aspirations, and dreams, it instead brought clouds of despair in their lives. Those who had promised them a sweet life on the other side were the very ones whose hands committed atrocities[5], including the rape of the uprooted people's mothers, sisters and daughters. The stories of the pain and broken dreams caused by Partition have been brought to life by many renowned Bengali writers. Among them are Jyotirmoyee Devi (1894-1988), Ritwik Ghatak (1925-1976) and Debesh Roy (1936-2020). A glance at the narrative worlds of Jyotirmoyee Devi's 'Epar Ganga Opar Ganga', Ritwik Ghatak's 'Shfatikapatra' and Debesh Roy's 'Udvastu' stories reveal vivid images of the shattered dreams of the displaced people[6].

Keywords: Partition, Devastated, Marginalized people, Independence, Atrocities, Displaced people

দেশভাগ সমাজের অন্তেবাসী মানুষের জীবন-জীবিকাকে কতটা বিপর্যস্ত-বিধ্বস্ত করে তুলেছিল তার ইয়ত্তা নেই। দেশভাগের কারণে রাতারাতি লক্ষ লক্ষ মানুষ বাধ্য হয় আপন ভিটেমাটি ত্যাগ করে এক অজানা দেশে পাড়ি দিতে। ফলে বাস্তুচ্যুত হয়ে তারা আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয় এবং সেই সঙ্গে বদলে যায় তাদের সামাজিক পরিচয়। সমগ্র দেশবাসী-দেশনেতাদের চোখে তারা যেন হয়ে পড়ে এক ভিনগ্রহীর মানব। স্বাধীনতা মানেই সব আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নের বাস্তবায়ন এমন ভাবনার বিপরীতে বরং তাদের জীবনে দেখা দেয় হতাশার মেঘ। স্বাধীনতা ছিন্নমূলদের জীবনে নিয়ে আসতে পারে না কোনো নতুন দিনের আলো। বরং যারা তাদের স্বপ্ন দেখিয়েছিল যে, ওপারে তোমাদের মধুর জীবন পড়ে আছে তাদেরই হাতে ধর্ষিত হতে হয় ছিন্নমূল মানবের মা-বোন ও বধূদের। সমালোচক যথার্থই বলেছেন,

> "ধর্মের ধুয়ো তুলে বাংলা ভাগ সম্পন্ন করে ক্ষমতার চাবি হাতে পেতেই খুলে গেল মুখোশ। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লিগ-কোনও পক্ষই আর লোক বিনিময়ের কথা উচ্চারণ করল না। তখন তাদের দেখে কে বলবে যে, ধর্ম নিয়ে সত্যি কোনও সমস্যা ছিল এবং স্বধর্মের মানুষের স্বার্থ রক্ষায় সত্যিই তারা চিন্তিত? শুধুমাত্র স্ব স্ব দেশে সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষিত হবে-এ রকম মৌখিক প্রতিশ্রুতি উভয় রাষ্ট্রের নেতাদের পক্ষ থেকে দেওয়া হল। সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের কাছে এ ভাবে স্বাধীনতা প্রাপ্তিকে একটা প্রহসন ও পরিহাসে পরিণত করা হল।"[১]

এই সমস্ত কারণেই দেশভাগ সমাজের দুর্বল অংশের মানুষের কাছে এক স্বপ্নভঙ্গের প্রতীক হয়ে দেখা দেয়। দেশভাগজনিত কারণে ছিন্নমূল মানুষের যন্ত্রণা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যের অনেক প্রথিতযশা সাহিত্যিক। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮), ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) এবং দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০)।

জ্যোতির্ময়ী দেবী (১৮৯৪-১৯৮৮) বিশ শতকের একজন লেখিকা। তিনি নারীবাদী লেখিকা হিসেবেই আমাদের কাছে পরিচিত। 'ছায়াপথ' (১৯৩৪), 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' (১৯৪৮), 'মনের অগোচরে' (১৯৫২), 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' (১৯৬৮) প্রভৃতি উপন্যাসে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীর অন্তঃস্বরের অন্বেষণ করেছেন। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় নারীরা যে আজন্মকাল ধরে শোষিত হয়ে আসছে সেই চিত্র তিনি সচক্ষে দেখেছেন। 'নারীর কথা' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> "যাঁরা কখনও নিজের সামান্য অভাব ত্রুটির কথাটাও মুখে বলতে সঙ্কোচ বোধ করেন, যাঁরা সমাজের উৎপীড়ন অত্যাচারকে বিধাতার আশীর্বাদের মতো মাথা পেতে নেন, নিজেদের মানসিক, শারীরিক কোনো কষ্টই গ্রাহ্য করেন না, তবু আপনাদেরই বাপ, আপনাদেরই কোলে করে মানুষ করা ভাই, পতিদেবতা (হোন বা না হোন) আপনাদেরই বুকের স্নেহধারা দিয়ে লালিত পুত্র সকলের কাছেই উৎপীড়িত হন না কি?"[২]

এই উৎপীড়িতদেরই অন্তঃস্বর তাঁর সাহিত্যের বিষয় হয়ে দেখা দেয়। তবে তিনি জানতেন যে, আমাদের সমাজব্যবস্থায় যে নারীরাই শুধু উৎপীড়িত তা নয়, পাশাপাশি সমাজের অন্তেবাসীরাও সমানভাবে উৎপীড়িত-শোষিত। তাদের কথাও তিনি সমানভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কথাসাহিত্যে।

ঋত্বিক ঘটক (১৯২৫-১৯৭৬) বিশ শতকের আরও একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক। নাটকের পাশাপাশি তিনি ছোটোগল্প রচনার ক্ষেত্রেও সিদ্ধহস্ত। ঋত্বিক ঘটকের জীবনদর্শন গভীরভাবে শোষিত ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি দায়বদ্ধ থাকায় তাঁর সাহিত্যে নিপীড়িত-শোষিত মানুষের সংগ্রাম এবং তাদের প্রতি অবিচারকে তুলে ধরা হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> "সব শিল্পই শেষে গিয়ে পৌঁছয় কবিতাতে। এবং সে কবিতা হয় মেহনতি মানুষের দুঃখ-দুর্দশার ঘামে ভেজা কবিতা। এ ছাড়া কোনো শিল্পের শেষ অবধি টেকার কোনো ব্যাপার থাকে না, কোনোদিন থাকেনি। বলতে দুঃখ হচ্ছে যে এই পোড়া বাংলা দেশে এইসব বহু পুরাতন কথা আজ আমাকেই আবার বলতে হচ্ছে। কিন্তু কথাটা হচ্ছে-এই কথাগুলো আজ আবার বেশ চেঁচিয়ে বলা দরকার।"[৩]

শোষক শ্রেণির পক্ষ নিয়ে কথা বলা বিশ শতকের অন্যতম সাহিত্যিক হলেন ঋত্বিক ঘটক।

বিশ শতকের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায় (১৯৩৬-২০২০) অন্তেবাসী মানুষের অমানুষিক শ্রম ও শোষণের স্বরূপটিকে তাঁর কথাসাহিত্যের প্রতিবেদনে তুলে ধরেছেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই ভূমিহীন কৃষক, দিনমজুর এবং দারিদ্র্যপীড়িত গ্রামীণ মানুষের জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। স্বভাবতই ভূমিহীন মানুষের কথা, কৃষকের কথাই তাঁর কথাসাহিত্যের সম্বল হয়ে উঠতে দেখা যায়। সমালোচক বলেছেন,

> "...দেবেশ বিপুল অভিনিবেশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের গঞ্জগ্রাম ও তার ব্রাত্য জীবনকে প্রতীকায়িত করে তুলেছেন। হাটের চালাঘরগুলিকে ঘিরে-থাকা বহুমাত্রিক অন্ধকার তাই তাঁর আখ্যানে আলাদা গুরুত্ব পায়।"[৪]

যাদের শ্রমের ওপর আমাদের সমাজব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে তাদের চাপা পড়ে থাকা জীবনের কথাকেই কথাসাহিত্যের বিষয় করে তুলে ধরেছেন সাহিত্যিক দেবেশ রায়। সেইসঙ্গে আমাদের নির্বাচিত তিন সাহিত্যিকের কথনবিশ্বে চোখ রাখলেই দেখা মিলবে ছিন্নমূল মানুষের স্বপ্নভঙ্গের চিত্র।

প্রথমেই জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' গল্পের কথনবিশ্বে প্রবেশ করা যাক। দেশভাগ মানবজীবনকে কতটা অসহায় করে তুলেছিল তার বলিষ্ঠ উদাহরণ আলোচ্য গল্পটি। দেশভাগ পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান

শিখা তখনও পুরোপুরি নিভিয়ে যায়নি। একশ্রেণির স্বার্থান্বেষী মানুষ তখনও সম্প্রীতির ঊর্ধ্বে সাম্প্রদায়িকতাকে মনের মধ্যে লালনপালন করতে থাকে এবং ভিনধর্মের মানুষ দেখলেই তারা রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে বিন্দুমাত্র পিছপা হয় না। এহেন অবস্থায় যারা হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার চিন্তাভাবনায় মশগুল ছিল তারাও বাধ্য হয় জন্মভূমি ত্যাগ করে অচেনা-অজানা কলকাতায় পাড়ি দিতে। ধনরত্ন নয়, নারীরা তাদের মান, পুরুষেরা তাদের জান বাঁচানোর তাগিদেই দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। এই বাস্তুত্যাগীদেরই স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পটি গড়ে উঠেছে।

সুদাম ঋষি ও তার স্ত্রী দুর্গা পঞ্চাশ-ষাট জনের একটি দলের সঙ্গে রাতের অন্ধকারে দেশের মায়া ত্যাগ করে কলকাতার উদ্দেশে পাড়ি দেয় নিজেদের মান-প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে। এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা তাদের তাড়া করলেও তারা নিরুপায়। প্রাণ থাকলে আবার সবকিছু গড়ে নেওয়া যাবে মনের মধ্যে কেবলমাত্র এই স্বপ্নকেই বাঁচিয়ে রেখে এই অর্ধমৃত মানুষগুলি বর্ডারের কাছাকাছি এসে পৌঁছায়,

> "জানে দেশ গেছে। স্বজন নেই। মাটি নেই। ধন নেই। অর্থ নেই। নিঃসম্বল নিঃস্ব। তবু এক ধর্মের এক জাতের মানুষ তো আছে। শেয়াল কুকুরের মতো তাড়িয়ে দেবে না। প্রাণ মান নিয়ে টানাটানি করবে না।"[৫]

এই দুঃসময়ে যেসব তথাকথিত দেশনেতারা এই নিঃসহায় মানুষগুলির পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছিলেন তারাও কোথায় যেন হারিয়ে যায়। অন্যদিকে চোরাচালানকারীরা এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এক বিরাট অঙ্কের মুনাফা লুটতে ব্যস্ত থাকে। এহেন অবস্থায় এইসব বাস্তুত্যাগী মানুষগুলির দুর্ভোগের আর সীমা থাকে না। সীমান্তে পৌঁছে তারা জানতে পারে পাসপোর্টহীন মানুষ ওপারে যেতে পারবে না। যাদের সামর্থ্য ছিল তারা অনায়াসেই সীমানা ত্যাগ করে কলকাতায় পাড়ি জমায়। পড়ে থাকে শুধু সুদাম আর তার স্ত্রী দুর্গা। সুদামের স্ত্রী দুর্গা বিশ-বাইশ বছরের সুশ্রী একজন নারী, জাতে মুচি। সকলের চোখ পড়ে তার উপর। সুদাম মাত্র পাঁচটাকাকে সম্বল করে দেশ ছাড়ে। আর দালালের দল তাদের ওপারে নিয়ে যাওয়ার জন্য পঁচিশ টাকা চায়। কিন্তু এটা ছিল তাদের ছল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল দুর্গাকে ভোগ করা।

দুর্গার দাদা কলকাতায় থাকে। সেখানে গেলে হয়তো কিছু টাকার ব্যবস্থা হতে পারে এই ভেবে সুদাম তার স্ত্রী দুর্গাকে বর্ডার লাগোয়া এক স্টেশনমাস্টারের কাছে রেখে চলে যায় কলকাতায়,

> "আমি যাবো আর আসবো। ওকে আপনার পোলাপান মনে করবেন। ও যা হয় ক'রে একটু ফুটিয়ে নেবে ওর "মায়ের" কাছে-আপনার বিবিসাহেবের কাছে। চিড়েমুড়ি খাবে। সঙ্গে আছে। দু-তিন দিন বই তো নয়। মা-জানের কাছে থাকবে।"[৬]

সুদামের দুর্দশা দেখে মাস্টারমশাই দুর্গাকে নিজের কাছে রেখে দেয়। আর দুর্বৃত্তরা এই সুযোগেই তো ছিল। এদিকে সুদাম দুইদিনের নাম করে কলকাতায় গেলেও দশদিনের মাথায়ও ফিরে আসতে পারে না। স্টেশনের কুলির দৌরাত্ম্য দিন দিন বাড়তেই থাকে। অবশেষে একুশ দিনের মাথায় সুদাম ফিরে আসে। ততদিনে সব শেষ। মাস্টারমশাই সত্য গোপন করে সুদামকে জানায় তার স্ত্রী দুর্গা জলে ডুবে মারা গেছে। কিন্তু সুদাম কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না এমন কথা। সে বারবার ফিরে আসে মাস্টারমশাইয়ের কাছে এবং বলে,

> "মা-জান, আমি মোছলমান হবো। তাহ'লেই তো ওরা আমাকে তারে ফিরে দিবে। তুমি তাদের তাই বলো গো। মোছলমানরা তো মোছলমানের বৌরে ঘরে রাখবে না। ফিরিয়ে দেবে। মা-জান, তুমি আমার মা, সাহেবেরে বুঝায়ে বলো। সে মরেনি। সে আমারে শিগগির আসবার জন্যি বলেছিল।"[৭]

কিন্তু তার এই কাতর অনুনয়-বিনয় এবং কলকাতা থেকে প্রাণ বাজি রেখে পঁচিশ টাকা নিয়ে আসা সবকিছুই বিফলে যায়। সে তার স্ত্রী দুর্গাকে আর ফিরে পায় না। আসলে,

> "নারী নির্যাতন ও ধর্ষণ, যুদ্ধ ও দেশভাগের আবশ্যিক শর্ত বলেই ধরা হয়। কারণ, নারী তো রাষ্ট্রসম্পদ। ধর্ষণের অত্যাচারের পরও যারা বেঁচে থাকে এবং বাধ্য হয় অবাঞ্ছিত গর্ভধারণে, সেই

> সংখ্যার হিসাব পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এছাড়াও গণনার বাইরে আছে সেই সব নারী, যারা শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে।"[৮]

দুর্গাও হয়তো দুর্বৃত্তদের অত্যাচার-অনাচার সহ্য করতে না পেরে বাধ্য হয় আত্মহত্যা করতে। হারিয়ে যায় দুর্গা। সেইসঙ্গে হারিয়ে যায় সুদামের বাঁচার স্বপ্ন। এইভাবেই জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগজনিত কারণে এক হতদরিদ্র্য পরিবারের স্বপ্নভঙ্গের কাহিনিকে তাঁর অমর সৃষ্টি 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' নামক ছোটোগল্পে তুলে ধরেছেন।

ঋত্বিক ঘটকের 'স্ফটিকপাত্র' এই ধারারই আর একটি ছোটোগল্প। দেশভাগের কারণে বাস্তুহারা শরণাগতদের রিফিউজি ক্যাম্পে যে সীমাহীন-অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছিল তারই মর্মন্তুদ কাহিনিকে কেন্দ্র করে আলোচ্য গল্পের কথনবিশ্ব গড়ে উঠেছে। দিল্লির কিছু দূরবর্তী এক রিফিউজি ক্যাম্পের চিত্র আলোচ্য গল্পে উঠে এসেছে। গল্পকার গল্পের শুরুতেই আমাদের জানিয়েছেন যে,

> "একটা মাঠের মধ্যে নতুন খাড়া-করা ছাউনি, বাস্তুহারাদের বস্তি। ঘর থেকে ঘরে সরে গিয়ে একই দৃশ্য দেখতে থাকলাম, জীবনধারণের প্রত্যেকটা জিনিশই মনে পড়ে তাদের অভাবের দরুণ। বীভৎস উলঙ্গ অভাব। নোংরা ছিন্ন কাপড়চোপড় আর কালিমাময় মুখচোখ। এই জানুয়ারি মাসে শীতে ঐ ছাউনিতে হিম আটকায় কতখানি, সেটা গবেষণার বিষয়।"[৯]

দেশভাগের যারা বলি তাদের করুণ চিত্র এর থেকে আর কী হতে পারে! অর্থলোভী-পিশাচরূপী দেশনেতারা বাস্তুত্যাগীদের দু-মুঠো দু-বেলা ঠিকমতো খাবারের ব্যবস্থা তো দূরের কথা, ন্যূনতম চিকিৎসারও যে ব্যবস্থা করতে পারেনি তা এই ক্যাম্পবাসীদের কাহিনিই প্রমাণ করে। তাই তো আমরা দেখি যে, দেশে যখন কলেরার প্রকোপ দেখা দেয় তখন অনেক ক্যাম্পবাসী দুধের শিশু বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। তেমনই এক সন্তানহারা মায়ের করুণ কাহিনি গল্পকার আমাদের শুনিয়েছেন। যে নারী দেশভাগজনিত কারণে শ্লীলতা আর পুত্র নিয়ে পঞ্চনদ অতিক্রম করে এদেশে পাড়ি দেয় সে নিজের বুকের সন্তানকে হারিয়েও একটি কম্বল নিয়ে ঘর থেকে পালিয়ে যায়,

> "পুত্র এবং সে বোধহয় কাল রাত পর্যন্ত ঐ এক জিনিশেই শীত নিবারণ করেছে। কাজেই নিজের পরিচয় দিলে ও-কম্বল এবং কাপড় কলেরার বীজসংক্রান্ত বলে কেড়ে নিত ওরা।"[১০]

গল্পের চমক এখানেই লুক্কায়িত। পুত্রের শোকে শোকাকুল-বিহ্বল জননীর কাছেও জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা হয়ে দাঁড়ায় একটি সাধারণ কম্বল। আসলে জীবন যখন কেবল অস্তিত্ব রক্ষার কঠোর সংগ্রামে পরিণত হয় তখন রক্তের সম্পর্কের চেয়ে বস্তুগত প্রয়োজন যে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সেই বিষয়টিকে এখানে সুকৌশলে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। সেইসঙ্গে তুলে ধরেছেন বাস্তুত্যাগীদের বিপর্যয়ের চিত্রও।

গল্পের পরবর্তী অংশে দেখি আর এক হতাশার চিত্র। এক বৃদ্ধকে এই স্বপ্ন দেখিয়েই দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় যে, ওপারে গেলে তুমি তোমার জাতভাইদের ফিরে পাবে, সেসঙ্গে ফিরে পাবে তোমার সম্পত্তি। বৃদ্ধের সম্পত্তির তালিকায় ছিল একটি খাটিয়া, দুটো ভইস, একটা লাঙল, কাপড়, তেজসপত্র ইত্যাদি। তিনি এই তালিকা সরকারকে দেখাবেন এবং সরকার তাকে তার হৃত সম্পত্তি ফেরত দেবে। তাঁর এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল

> "ওরা যে তাই বলল। বলল, ওখানে তোমার সব দেবে! হিন্দু ভাইদের দেশ।"[১১]

কিন্তু অচিরেই তার স্বপ্নভঙ্গ হয়। যে সরকার তাকে কথা দিয়েছিল সবকিছু ফিরে পাবার, স্বাধীন রাষ্ট্রে ফিরে সে আর সেই সরকারের দেখা পায় না। কথক তাকে জানায়,

> "তবে যে-ই বলুক, মিথ্যে স্তোক দিয়েছে! ও-জিনিশ এখানে আর তুমি পাবে না। ও-আশা ছেড়ে দাও। আর পণ্ডিতজির সঙ্গে দেখা করাই বৃথা, হয়তো দেখা না-ও হতে পারে।"[১২]

এই নির্মম সত্য বৃদ্ধের মনে গভীর আঘাত হানে। তিনি হুংকার দিয়ে বলেন,

> "দুশমনটা কে? ...কে দুশমন? একবার চিনতে পারলে তার টুটিটা কামড়ে ছিঁড়ে নিয়ে একেবারে কাবার করে দিই!"[১৩]

বৃদ্ধের এই ক্রোধ একটি রাষ্ট্রের প্রতি তার চূড়ান্ত মোহভঙ্গ-স্বপ্নভঙ্গেরই নিদর্শন বলে আমরা মনে করি।

দেবেশ রায় তাঁর জনপ্রিয় 'উদ্বাস্তু' গল্পে শিকড়হারা মানবের যন্ত্রণার প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরেছেন। গল্পটি শুরু হয়েছে এপার বাংলায় অবস্থিত সত্যব্রত লাহিড়ী, তার স্ত্রী অণিমা এবং একমাত্র সন্তান অঞ্জুর জীবনকাহিনিকে কেন্দ্র

করে। সত্যব্রত লাহিড়ীর আদিনিবাস পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে ২৩০/এ/৬ হোল্ডিংস্থ মোকানে বাস করেন। এই হোল্ডিংয়ের জন্য 'দেয় মিউনিসিপ্যাল কর' গত বারো বৎসর যাবৎ তিনি দিয়ে আসছেন। কিন্তু সরকারের এক সিদ্ধাতেই তাদের ব্যক্তিগত এবং সাংসারিক জীবনে নেমে আসে চরম অন্ধকার। কেননা সরকার নানান সূত্র মারফত জানতে পারে যে, সত্যব্রত ও অণিমা বলে যারা বর্তমানে ভারতে বসবাস করছেন তারা আদতে ছদ্মনামধারী বহিরাগত নয়তো অন্য কেউ যারা এমন নাম ধারণ করে অবৈধভাবে ভারতে বসবাস করছে। সরকার তদন্তের মাধ্যমে জানতে পারে যে,

> "মৃত পুণ্যব্রত লাহিড়ীর পুত্র সত্যব্রত লাহিড়ী নামধেয় ব্যক্তি ১৯৪৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করেছিলেন বটে, কিন্তু পর বৎসরই তিনি-খুলনা যাবার পথে ট্রেনের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নিহত হন।"[১৪]

ফলে বর্তমানে জীবিত সত্যব্রত লাহিড়ী আসলে মৃত বা জাল সত্যব্রত। একই কথা প্রযোজ্য অণিমার ক্ষেত্রেও। যে সত্যব্রত লাহিড়ী ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দের ৩০-এ জুলাই চব্বিশ পরগনা জেলার মুখেরা গ্রামের হেমচন্দ্র সান্যালের দ্বিতীয়া কন্যা অণিমা সান্যালকে হিন্দুশাস্ত্রমতে শালগ্রাম শিলা ও অগ্নিসাক্ষী রেখে বিবাহ করেন; মৃত বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী উভয়েই এই বিবাহে পৌরোহিত্য করেন; নথি ঘেঁটে সরকার জানতে পারে সেই অণিমা নাকি কুমকুম এবং এনামুল হকচৌধুরীর বিবাহিত স্ত্রী। এনামুলের সক্রিয় ইচ্ছায় এবং উৎসাহে শারীরিক ও মানসিক স্বস্তি ও শান্তির জন্য অণিমা ভারত ইউনিয়নে আসে। অতঃপর তার পিতা আবার বিবাহ দেন সত্যব্রতর সঙ্গে।

দেশজুড়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘের 'খাঁটি ব্যক্তির সন্ধান' কর্মসূচি এমনই নানান জটিল সমস্যার উত্থাপন করেছিল এবং জেনেবুঝেই সরকার এই সমস্ত বাস্তুত্যাগীদের সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছিল। যদিও এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশভাগের ফলে পরিবর্তিত বিশ্বে ফেরারি ও বেনামা ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা এবং তাদের আটক করা,

> "আমরা এক তথ্যসংগ্রহ অভিযানের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে জানতে পারি যে পৃথিবীগ্রহে বর্তমানে বহু ফেবারি ও বেনামা ব্যক্তি আছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষ-পাকিস্তান, উত্তর ভিয়েৎনাম-দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, উত্তর কোরিয়া-দক্ষিণ কোরিয়া, পূর্ব জার্মানি-পশ্চিম জার্মানি ইত্যাদি দেশগুলিতে। ...বিশ্ববাসীকে অনুরোধ করছি তাঁরা যেন স্ব-স্ব আত্মপরিচয় নিয়ে নিকটবর্তী থানায় হাজিরা দেন।"[১৫]

তা সত্ত্বেও আমার বলতে পারি যে, যারা দেশভাগের বলি তাদের ক্ষেত্রে এ সংবাদ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাতই। যারা এক কাপড়েই জান ও মানকে সম্বল করে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল তাদের কাছ থেকে যদি বারো বছর পর মৌলিক, আদি, অকৃত্রিম আত্মপরিচয়ের প্রমাণপত্র চাওয়া হয় তাহলে সেটা বিনা মেঘে বজ্রপাত নয় তো কী? দেশভাগ ও তৎপরবর্তী নানান রাজনৈতিক ছল-চাতুরির কারণে বাস্তুত্যাগীদের জীবন কতটা ভঙ্গুর হতে পারে তার প্রমাণ আলোচ্য গল্পটি। সত্যব্রত তার জীবদ্দশায় আপন পরিবার ও সমাজের কাছে জীবিত থেকেও মৃত হয়ে যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, যারা যুগ যুগ ধরে দারিদ্র্য-বঞ্চনার শিকার সেইসব অন্তেবাসী ছিন্নমূল মানুষের আত্মমর্যাদার চরম অবক্ষয় এবং তুচ্ছ অস্তিত্বের করুণ চিত্র তুলে ধরে ধরেছেন আলোচ্য তিন সাহিত্যিক। রাতারাতি একটি অখণ্ড ভূখণ্ডকে দ্বিখণ্ডিত করার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত হাজার হাজার অন্তেবাসী মানুষের জীবনে চরম অনিশ্চয়তা নিয়ে এসেছিল; যেখানে জীবনের মৌলিক চাহিদাটুকুও ছিল অনিশ্চিত। ভিটে-মাটি, স্মৃতি ও শিকড় থেকে উৎখাত ছিন্নমূল মানুষের সীমাহীন দুর্ভোগ-স্বপ্নভঙ্গের বাস্তব চিত্রকে জ্যোতির্ময়ী দেবী, ঋত্বিক ঘটক এবং দেবেশ রায় আলোচ্য তিন গল্পে তুলে ধরেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগে নিম্নবর্ণ। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০, পৃ. ২৪।
২. দেবী, জ্যোতির্ময়ী। নারীর কথা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, ৪র্থ খণ্ড। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১৩২-১৩৩।
৩. ঘটক, ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু। নিউ এজ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭২, পৃ. ২০।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের বহুস্বর। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৯২।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪৫।
৬. তদেব, পৃ. ৪৭।
৭. তদেব, পৃ. ৫০।
৮. হীরা, আশিস (সম্পা.) । একাত্তরের বাংলাদেশ: নারীর অবস্থান, দেশভাগ ও নারী: ভাঙা দেশ নতুন গড়ন। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২১, পৃ. ৭৬।
৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । স্ফটিকপাত্র, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ২৭১।
১০. তদেব, পৃ. ২৭২-২৭৩।
১১. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১২. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১৩. তদেব, পৃ. ২৭৫।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । উদ্বাস্তু, ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৪২৬।
১৫. তদেব, পৃ. ৪২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগে নিম্নবর্ণ। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২০।
২. দেবী, জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা-সংকলন, ৪র্থ খণ্ড। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৪।
৩. ঘটক ঋত্বিক। চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু। নিউ এজ পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৭২।
৪. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের বহুস্বর। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১৫।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র (সম্পা.) । ভেদ-বিভেদ। দে'জ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯২।
৬. হীরা, আশিস (সম্পা.) । দেশভাগ ও নারী: ভাঙা দেশ নতুন গড়ন। গাঙচিল, কলকাতা, ২০২১।